



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 438 - 446

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংশপ্তক’ : জীবনের বৃহৎ-ভাবনার প্রতিফলন

সাবিনা ইয়াসমিন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সূচীপাড়া ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর, বাংলাদেশ

Email ID: [sabinayasminsetu21@gmail.com](mailto:sabinayasminsetu21@gmail.com)



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Community,  
Historical,  
Supermatism,  
Socialism,  
Pictorial,  
Reversions,  
Reproduction,  
Communal,  
Exploitive,  
Self-reliance.

### Abstract

Shahidullah Kaiser's novel *Sangsaptak* reflects the author's mature artistic imagination and creative mastery. In portraying the intimate realities of Muslim society, he analysis individual resistance as well as familial and social conflicts. Due to its variant thematic and structural features, the novel defies easy categorization and cannot be confined to any single literary genre such as political, social, or historical fiction. Within its broad narrative canvas, the novel depicts the lived realities of the lower-and middle-class communities of two villages in Bangladesh, alongside vivid portrayals of urban life in Kolkata and Dhaka. Moreover, the narrative unfolds against the backdrop of major historical events, including the Second World War, famine, communal riots, and the politics of the Partition. By focusing on a limited social group, the novelist succeeds in representing the life patterns and transformations of the broader population of Bangladesh, ultimately suggesting the possibility of a resilient and struggle-oriented future.

### Discussion

‘সংশপ্তক’ শহীদুল্লা কায়সারের প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। তাঁর কারাজীবনের তৃতীয় পর্বের প্রায় সবটুকু সময় জুড়ে (১৯৫৯-১৯৬২) এ উপন্যাসের রচনায় ব্রতী ছিলেন। পরে এটি শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। ব্যাপ্তি ও প্রসারে এ মহাকাব্যিক উপন্যাসটির কাহিনির কালগত পরিসীমা ‘১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকাল থেকে শুরু করে বিভাগোত্তর কালে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার সামাজিক জীবনসত্য এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলার চাটখিলের অখ্যাত দুটি গ্রাম বাকুলিয়া-তালতলির জীবনধারাকে পটভূমি করে রচিত হলেও সংশপ্তক উপন্যাসের বিস্তৃতি বিভাগ-পূর্বকালের মহানগরী কলকাতা থেকে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত। আরও নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে বলা যায়, -

“উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে উঠে এসেছে সামন্ত-অভিজাত্যের শেষ নিঃশ্বাস, পূর্ব-বাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন কলকাতা-জীবন এবং বিভাগকালীন ঢাকার চালচিত্র।” (ঘোষ, ১৯৯১ : ২৫)

উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু উপকূলবর্তী মুসলিম-প্রধান গ্রাম বাকুলিয়ার প্রাচীন ও বনেদী সৈয়দ পরিবার। প্রাচীন মুসলিম পরিবারের রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবেশ সত্ত্বেও এ পরিবারে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাসিকের হাতে প্রথাবদ্ধ সংস্কারে বিশ্বাসী সৈয়দ পরিবারের চিত্র নিম্নরূপ -

“দীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আর বাস্তবের পৃথিবী, এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দবাড়ি। চল্লিশের ওপারের পুরুষ মহিলারা সবাই হজ্জ সেরে এসেছেন। কর্তা সৈয়দ দু’দুবার হজ্জ করেছেন। নিজের ইংরেজী ডিগ্রি আর ইংরেজের আপিসে বড় চাকুরিটার সাথে লম্বা দাড়ি, লম্বা কোর্তা আর মদিনা শরীফের গোলটুপীর লেবাসটাকে অতি সহজে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। (কায়সার, ১৯৮৭ : ৮৭)

সৈয়দ সাহেব ইংরেজি শিক্ষিত ও সরকারি চাকরিজীবী হলেও বিশ্বাসে ও জীবনচরণে সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শবাদী মুসলিম। চাকরিসূত্রেই তিনি কর্মস্থল কলকাতায় বসবাস করেন। সৈয়দগিনী এবং কন্যা আরিফা থাকে বাকুলিয়ায়। সৈয়দ সাহেবের পুত্র জাহেদ কলেজে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় থাকে এবং কালেভদ্রে গ্রামে আসে। সৈয়দ সাহেবের ছোটভাই আলাদা চরিত্রের মানুষ। তার সম্পর্কে উপন্যাসিকের ভাষ্য -

সৈয়দবাড়ির বুর্জু এলেমদার পুরুষ। দেশী, বিদেশী, ইংরেজী, আরবি, ফারসি, কত বিদ্যে তাঁর। সেই মানুষ, হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল, তাজা বউ আর তিন মাসের মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সে তো প্রায় তের-চৌদ্দ বছর আগের কথা। কোথায় কোথায় যে চষে বেড়াচ্ছে লোকটা, আজ যদি খবর আসে নোঙ্গর ফেলেছে বেরিলীতে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চলে গেছে দেওবন্দে। হঠাৎ হয়ত খবর পাওয়া গেল বড় পীর সাহেবের মাজার জিয়ারতে গেছে বোগদাদে, সেখান থেকে কারবালায়। (কায়সার, ১৯৮৭ : ৮৮)

তিনি শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে দরবেশ রূপে ‘মাইজভান্ডারি’র আস্তানায় আশ্রয় নেন। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যা রাবু সৈয়দগিনীর সঙ্গে সৈয়দবাড়িতেই থাকে। গৃহপরিচারিকা ও মক্তবের মুন্সীজীর একমাত্র সন্তান আব্দুল মালেক ওরফে মালু পিতামাতার সঙ্গে এ বাড়িতে আশ্রিত। আশৈশব গান শোনা এবং স্বকণ্ঠে গান তোলার প্রতি মালুর ঝোঁক অতি প্রবল। তার জীবনকে কেন্দ্র করেই বাকুলিয়া-তালতলি-কলকাতা-ঢাকায় প্রবহমান সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের ঘটনাবলির অগ্রগতি। অভিজাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিধায় সৈয়দ পরিবার থেকে সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়নি। একারণেই বলা যায়, কলেজছাত্র জাহেদ পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই আলিগড়ে শিক্ষালাভকালে দ্বিজাতিতত্ত্বে অনুরক্ত হয় এবং গ্রামে ফিরে এসে সামন্ত-স্বার্থের প্রতিভূ ও বিভূত্বিনদের একত্রিত করে সামন্ত-আদর্শ নির্ভর রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাকুলিয়ার স্কুলমাস্টার সেকান্দরের প্রতি জাহেদের বক্তব্যে তার সামন্ত মতাদর্শের পরিচয় সুস্পষ্ট : ‘আমাদের শত্রু যে এক নয়, আমাদের শত্রু যে দুই - এক ইংরেজ, দোসরা হিন্দু বানিয়া মহাজন, তুমি কি মনে কর এ কথাটা বুঝতে মুসলিম সমাজের খুব দেবী লাগবে? ওই গাদ্দারগুলোকে চিনতে খুব বেশী সময় লাগবে?’ (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৩৫)

পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী জাহেদ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রনিহিত মানবকল্যাণ চিন্তায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শ্রমিক রাজনীতিতে কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করে। বিভাগোত্তরকালে ঢাকায় শ্রমিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত থাকার জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় সে নিজগ্রাম বাকুলিয়ায় ফিরে আসে এবং গ্রামের নিম্নবিত্ত ও বিভূত্বিনদের শ্রেণি-সংগ্রামের আদর্শে উজ্জীবিত করে একই পতাকাতে সমবেত করতে সমর্থ হয়। বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতে ধর্মীয়-স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রেণিত্যাগে সফল হয়। কিন্তু অন্তরে-বাহিরে সর্বদা সংগ্রামশীল জাহেদ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের পুলিশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়।

বাকুলিয়ার আধিপত্যবাদী মিঞা পরিবারের কনিষ্ঠ পুরুষ ফেলু মিঞা শাসন-শোষণ ও আভিজাত্যের অহংকারে পূর্ণ। বিশেষ আত্মীয়তায় সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ পরিবারের সাথে মিঞা পরিবারের রেঘারেষির সম্পর্ক। এ পরিবারের সদস্যরাও সামন্ত মতাদর্শের। হিন্দু প্রধান তালতলিতে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও পার্শ্ববর্তী বাকুলিয়ার প্রায় সবাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তালতলির চেয়ে বাকুলিয়ার সামন্তবাদী-সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী। বাল্যবধি সৈয়দ পরিবারে আশ্রিত অল্পশিক্ষিত ও পালাগানের বয়াতি মালু যুদ্ধের সময় তালতলিতে দোকানের কাজ নেয় এবং অশোকের কাছে গানের বিধিবদ্ধ নিয়ম, রাগ-রাগিনীর শৃঙ্খলা এবং তাল-বোলের কলাকৌশল সম্বন্ধে তালিম নেয়। পরবর্তী সময়ে সে পল্লীগীতির গায়করূপে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বেতার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগান্তর কালে ঢাকা বেতারে বড় চাকুরি নিয়ে ধনীকন্যা রিহানাকে বিয়ে করে এবং দাম্পত্যজীবনে অসুখী মালু বাকুলিয়ায় ফিরে আসে। অন্যদিকে, ‘কবীরা গুনাহ’, ‘যেনাহ’ করার অপরাধে গ্রাম্য-শালিসে সাজাপ্রাপ্ত স্বজনহারা বিত্তহীন হুমতি বাকুলিয়া ছেড়ে গোরাসৈন্যদের সাথে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় এবং পাকিস্তান অভ্যুদয়ের পর বিপত্তীক লোককে বিয়ে করে ঢাকায় বসবাস করে। কাহিনির সমাপ্তিতে তারা বাকুলিয়ায় ফিরে আসে।

সংশ্লিষ্ট উপন্যাসে পূর্ব বাংলার দুটি গ্রামের কয়েকটি পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কলকাতা-ঢাকার নগর-পরিবেশ এবং বাকুলিয়া-তালতলির গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক চালচিত্র এ উপন্যাসে বিন্যস্ত। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসানকল্পে ইংরেজ বিতাড়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও বিভাগান্তর কালে নতুন দেশের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। বহু নর-নারীর পদচারণা-মুখর এ উপন্যাসের কাহিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে গড়ে উঠেছে। সে প্রেক্ষিতে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ‘মুক্তির মূলমন্ত্র’ (ইকবাল, ১৯৯১ : ১৮১) বলে অভিহিত করা যায়। সংশ্লিষ্ট উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সার দুই শ্রেণির মানুষের জীবন-তরঙ্গের ছবি এঁকেছেন। তিনি ‘নায়ককল্প চরিত্রের ধারণা’য় অগ্রসর না হয়ে সমকালীন পচনশীল সামন্তবাদী সমাজভুক্ত কিছু অগ্রসর ও স্বাভাবিক চরিত্র এই উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন চরিত্র জাহেদ পূর্ব-বাংলার এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী জমিদার পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে সে আলিগড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ‘আলিগড় আন্দোলন’ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামন্ত মতাদর্শপুষ্ট সৈয়দবাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে সে ‘মুসলিম লীগ’ ও ‘পাকিস্তান আন্দোলন’ সমর্থন করে। সে গ্রামে ফিরে এসে ‘পাকিস্তান আন্দোলন’র প্রচারে আত্মনিয়োগ করে এবং ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের জাগরণ ঘটাতে উৎসাহী হয়। স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয়তায় বিশ্বাসী জাহেদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত রাজনীতিতে সন্দিহান। সে স্বরাজে অবিশ্বাসী। তার ভাষায় –

“স্বরাজ মানে তো হিন্দুরাজ। ওতে মুসলমানদের কি হবে? প্রায় দুশো বছর তো ইংরেজের গুঁতো খেয়ে খেয়ে কাটল। স্বরাজ এলে পর শুরু হবে বেনে-মুৎসুদির গুঁতো।” (কায়সার, ১৯৮৭ : ১১০)

এদেশীয় মুসলিম সমাজকে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সারা ভারতের মুসলমানকে সংঘবদ্ধ করায় সচেষ্ট সাহেদ। একারণেই সে বাকুলিয়ার বিত্তহীনদের সাথে ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি তালুকদার-প্রেসিডেন্ট ফেলুমিঞাসহ মুসলিম লীগ সংগঠিত করতে চায়। কিন্তু ফেলু মিঞার গদি ভাগাভাগির মতলবটা বুঝতে পেরে জাহেদ তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় –

দুশো বছরের ইংরেজ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য লড়াই আমরা। সে মুক্তির রূপ অতি স্পষ্ট : দেশের মাটি আমার, দেশের সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোটাতে হাসির ছটা। আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখনতে জেঁতে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু। (কায়সার, ১৯৮৭ : ১১৩)

জাহেদ তার পাঠশালার সহপাঠী অখচ পাঁচবছরের বড় সেকান্দর মাস্টারকে মুসলিম লীগের দায়িত্ব নিতে বলে এবং নতুন রাষ্ট্রের কল্পিত ছবিটি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরে। প্রথমে সেকান্দর মাস্টার জাহেদের সাথে একমত পোষণ করে কাজ করলেও পরবর্তী সময় অসাম্প্রদায়িক ও শ্রেণি সচেতন সেকান্দর জাহেদের মুখে যেন ফেলু মিঞার

কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। মধ্যবিত্ত কৃষক-সন্তান সেকান্দর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেনি। তার জন্ম মুসলিম-প্রধান বাকুলিয়ায়, আর শিক্ষা ও চাকুরি হিন্দুপ্রধান তালতলিতে। সরল গাঁয়ের মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলেই শিক্ষিত সেকান্দর মাস্টারকে তারা ভক্তিভরে আপনজন মনে করে। যেমন-সন্তানের গৌরবে গর্বিত পিতার মতো সেকান্দর মাস্টারের কথা বলতে বলতে বাকুলিয়ার কৃষকদের বুকটাও ফুলে ওঠে। ও যে কৃষকের সন্তান। আর মিঞা এবং সৈয়দ বাড়ির বাইরে একমাত্র সেকান্দরই তো দু'দুটো পাস দিয়েছে, বি. এ. পর্যন্ত পড়েছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে এমন একটা ছেলেও তো নেই বাকুলিয়ার কৃষকদের। তাই মাস্টার ওদের গৌরব। ওদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস, স্নেহপ্রীতি আর বোধহয় অনেক আশা ভরসা ওকে ঘিরে। (কায়সার, ১৯৮৭ : ৬১-৬২)

প্রতিভাবান সেকান্দর বিশ্বাস করত দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেই তার প্রতিভার বিকাশ ঘটবে কিন্তু 'অভিভাবকহীন দরিদ্র সংসারের অভাব নামক নিষ্ঠুর দৈত্যটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওর শৈশব আর কৈশোরের সেই বিশ্বাস' (কায়সার, ১৯৮৭ : ৬৬)। পরার্থে জীবন উৎসর্গকারী সেকান্দর মাস্টার বাকুলিয়ার বিত্তহীনদের খাজনা মাফ করে দেয়ার জন্য ফেলু মিঞাকে অনুরোধ করেছে। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে অনুপ্রাণিত সেকান্দর বাকুলিয়া-তালতলির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক জীবনধারাকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায়। তার কাছে স্বাধীনতার গুটার্থ শুধু ইংরেজ বিতাড়ন নয় বরং আরো ব্যাপক। জাহেদ-সেকান্দরের রাজনৈতিক বিতর্কে উভয়ের এ মতাদর্শ প্রকাশিত -

রাবিশ। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ আর ছিনিয়ে নিল সেকান্দরের বগলের বইগুলো, ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। চৌচিয়ে চলল, এই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি সেকান্দর, তালতলির ওই হিন্দু মাস্টারগুলো থেকে দূরে থেকে, রাজনীতিটা বুঝবার আগেই তোমার মাথায় একগাদা পোকা ঢুকিয়েছে, এরপর আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে। (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৩৭)

ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করেও রাজনীতি-ইতিহাস সচেতন সেকান্দর সংস্কারমুক্ত এক অনন্য চরিত্র। তার কাছে তাই প্রথমে মানুষ পরে ধর্মের স্থান। সমাজের অত্যাচারিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিতের সাথে একাত্ম সেকান্দর প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল থেকেছে। সে তার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ জাহেদকে বোঝাতে সচেষ্ট হয়-

“আমার কথা হল : সমাজটাকে মেরামত কর। শিক্ষা দাও, আলো দাও - গোঁড়ামির অচলায়তন ভেঙ্গে উন্মুক্ত কর বুদ্ধির দ্বার, কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে এনে দাও যুক্তির প্লাবন। মনটা রইল তোমার শৃঙ্খলে, চাও তুমি মুক্তি। সে কি সম্ভব, না কাম্য?” (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৫৬)

জাহেদ যুক্তির নির্দেশে পথ চললেও তার বুদ্ধিটা আবেগ-আচ্ছন্ন। সেকান্দরের এসব চিন্তা-ভাবনা, রাবুর বিয়ে ও বিবাহোত্তর ঘটনার অভিঘাতে জাহেদের তারুণ্যের রঙমোড়া আবেগ টুটে গিয়ে তার সমুখে বাস্তবের কাঠিন্য প্রকাশিত হয়। বাস্তবতার জটিলতায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী জাহেদ শেষপর্যন্ত সেকান্দর মাস্টারের যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা ও মতাদর্শে প্রাণিত হয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায় -

আবেগ দিয়ে বোঝা যায় না জীবনের জটিলতাকে, চেনা যায় না বিচিত্র জটবাঁধা এই পৃথিবীকে। জাহেদের কাছে এ যেন এক হঠাৎ আবিষ্কার যা ওর তারুণ্যের আবেগ দিয়ে গড়া সহজ পৃথিবীটাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সে ভাঙ্গার ফুটো দিয়ে যে পৃথিবীটা উঁকি মেরে চায় সেখানে শুধু কুসংস্কার, নীচতা, অন্ধবিশ্বাস, কদর্য তার চেহারা। সেখানে সব কিছুই যেন জটিল। (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৫২)

দরিদ্র ও শোষিত মানুষের সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা, ১৯৪৩-এর মহাস্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সেকান্দর মাস্টার এতটাই একাত্ম হয়েছিল যা সাধারণত বিরল। সে গ্রামের দরিদ্র জনগণকে ত্যাগ করে পালিয়ে বাঁচতে চায়নি। তার মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নপর মানসিকতা দুর্লক্ষণীয়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা এসব প্রেক্ষাপটে দেশের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুবাদের ব্যবসানির্ভর মধ্যবিত্ত রামদয়াল ও মধ্যসত্ত্বভোগী রমজান প্রচুর অর্থসম্পদ অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও আদর্শনিষ্ঠ সেকান্দর মাস্টার বরাবর সৎ থেকেছে। রায়ট ও

দেশবিভাগের পর যখন এদেশের মানুষ ওদেশে গিয়েছে আর ওদেশের মানুষ এসেছে এদেশে, রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতায় গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে তখন সেকান্দর সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও নৈতিক জাগরণ ঘটতে গ্রামের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা এরূপ -

তালতলির হিন্দুরা চলে যাবার পর ছাত্রের অভাব, শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব, এত অভাবের মুখে বন্ধই হয়ে যেত ইস্কুলটা, যেমন বন্ধ হয়েছে উদ্রাজপুর আর চাটখিলের স্কুল। বন্ধ হতে দেয়নি সেকান্দর মাস্টার। কয়েকজন ভাল মাস্টার, ওদের দেশতাগ করতে দেয়নি সেকান্দর, পায়ে ধরে রেখে দিয়েছে। এদিক ওদিক থেকে রীতিমত পায়ে ধরে ধরে ছাত্র এনেছে, জাগীরের ব্যবস্থা করেছে সেকান্দর। তবে না আজ আবার গমগম করছে তালতলির স্কুল। (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৬২)

সেকান্দরের অনুসৃত ধারায় রূপান্তরিত জাহেদ শ্রেণি-সংগ্রামের লক্ষ্যে শ্রমিক রাজনীতির আদর্শ গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করে নবজাগরণের আয়োজনে সচেষ্ট হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক কর্মী জাহেদ এতটাই আত্মোৎসর্গীকৃত যে ‘সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত বাধা, স্পর্শকাতর মনের যত জটিলতা জয় করে’ যার সাথে মন মিলিয়েছিল, আন্দোলনের কাজে ছেদ পড়ার ভয়ে তাকেও বিয়ে করেনি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জাহেদ নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে জাহেদ শহরের শ্রমিক-মজুর শ্রেণিকে সংগঠিত করার মতো গ্রামের বিত্তহীনদের নিয়ে গ্রামবাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুনতর ভূমিকা রাখে। গ্রামের কর্দমাক্ত রাস্তা, উঁচু শক্তমাটির সড়ক, ঘাস, মাড়িয়ে জাহেদ শোষিত, বঞ্চিত দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করার ব্রতে নিয়োজিত। উন্নয়নের কর্মে মগ্ন থেকেও জাহেদ জেনে যায় মালুর অপমানিত ও বিকৃত অতীত জীবনের কথা। বাস্তবতায় অভিজ্ঞ ও আত্মপ্রত্যয়ী জাহেদ কাজের অবসরে তাই যন্ত্রণাদগ্ধ মালুকে জীবনের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়। তার বক্তব্য এরূপ -

“এক ধারায় নয়, বহু ধারায় প্রবাহিত মানুষের জীবন। যদি শুকিয়ে যায়, যদি রুদ্ধ হয় একটি ধারা আর এক ধারায় জীবন বয়ে চলে সার্থকতার পানে। এটাই জীবনের ধর্ম। সহস্র ধারায় জীবনের বিকাশ, অজস্র পথে তার পূর্ণতা।” (কায়সার, ১৯৮৭ : ৩৬৪)

সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবে নিষ্ঠাবান ও সম্ভাবনাময় জাহেদ আত্মত্যাগে ও সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল। ভাববাদী চেতনা থেকে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় তার উত্তরণ এদেশীয় তরুণদের একাংশের প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। ‘জাহেদ চরিত্রের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের আত্মরূপান্তরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাস্তবের অভিঘাতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীতে রূপান্তর একটা দ্বন্দ্বময় অথচ বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে’ (খান, ১৯৯৭ : ১৭০)। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে জাহেদকে কাজ করতে দেখে আজীবন সংগ্রামী সেকান্দর মাস্টার আরক ‘সংগ্রাম’কে লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তার আত্মবিশ্বাস, ‘দুঃখজয়ী যারা তারা ই তো জীবনজয়ী। জীবনদাতাও। কোন বঞ্চনাই তাদের কাছে বঞ্চনা নয়। বঞ্চনার সড়ক ধরেই ওরা এগিয়ে যায় মহাপ্রাপ্তির দিকে’ (কায়সার, ১৯৮৭ : ৩৩৯)। জীবনের কঠিনতম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজের জীবনকে যেমন যাচাই করেছে তেমনি তার সাম্যবাদী আদর্শ জাহেদ, মালু, রাবুকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনে সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি বিশাল অংশ আত্মনিয়োগ করলেও বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ ধারার ভূমিকাও ছিল অত্যুজ্জ্বল। এ ধারার প্রবক্তা সেকান্দর মাস্টার। মূলত ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শের প্রতিফলন এ চরিত্রে সর্বোতভাবে ব্যাপ্ত। কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার সেকান্দর মাস্টার চরিত্রটিকে সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে এঁকেছেন এবং তার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ উপন্যাসের মূল ধারায় প্রবাহিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র সৈয়দা রাবেয়া খাতুন ওরফে রাবু শৈশবেই মাতৃহীন। দরবেশ পিতার অনুপস্থিতিতে চাচাত ভাইবোনদের সাথে সে বাকুলিয়ার সৈয়দ পরিবারেই বসবাস করে। চৌদ্দ বছরের রাবুর ‘কাজল রেখার মত চিকন ক্রু। সে ক্রুর নিচে একজোড়া ডাগর কালো চোখ। নক্সার মতো নিখুঁত ফর্সা মুখ। পাতলা ত্বকে কিশোরী লাভণ্য আর স্বাস্থ্যের শ্রী’ (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৫৩)। ছোটবেলা থেকেই সে ডানপিটে স্বভাবের— ‘পর্দা’ করার সময় হলে

আরিফাসহ সে বোরখা পড়ে, নামাজ পড়ে, পরপুরুষের সামনে বের হয় না কিন্তু সুযোগ পেলে নিয়ম বা পর্দা ভঙ্গ করতেও পিছপা হয় না। মাতাপিতার স্নেহবঞ্চিত রাবুকে গ্রামে শিক্ষাগ্রহণ কালেই এক বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে বিয়ে দেয় তার সংসারত্যাগী দরবেশ পিতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা রাবু ভয়ে ও ললাট লিখনের ওপর নির্ভর করে পিতার স্বৈর ইচ্ছার কাছে পরাজিত হয়ে নির্বিবাদে ষাট বছরের বৃদ্ধ বুজরগের সাথে পরিণয়বন্ধ হতে বাধ্য হয়। সামন্ত সমাজের এই চিত্রটি দক্ষতার সাথে ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন। তাঁর বর্ণনা -

চৌদ্দ বছরের রাবু। মৃত মায়ের বিয়ের শাড়ি বেনারশি আর বিয়ের হারখানা পরে ও এল বাসর-ঘরে। পিতার মতো বৃদ্ধ পীরের আলিঙ্গনে ও পেল নারীত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা। হয়ত শেষ। পুরুষ অভিজ্ঞতা হয়তো আর কখনো আসবে না ওর জীবনে। হয়ত চিরকালের জন্যই ওর অচেতনা থেকে গেল পুরুষের সেরা সম্পদ, যৌবন নামের সেই পরম বিস্ময়। (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৩৪)

পরবর্তীকালে রাবু কলকাতায় এসে ব্রুবোর্ণ কলেজে পড়াশোনা করে ইতিহাস বিষয়ে অনার্সসহ বিএ পাশ করে। ছাত্রী অবস্থাতেই জাহেদের সাথে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল-মিটিং করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দুর্ভিক্ষে, মানুষের সাহায্যে আন্দোলনে নেমেছে। আধুনিক শিক্ষালাভের ফলে রাবুর বিবেক ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা থেকে যে বিদ্রোহের শুরু তা-ই তাকে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাবু জাহেদকে ভালোবাসে কিন্তু সংসারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। কারণ তাতে জাহেদের দেশ গড়ার স্বপ্নে চিড় ধরতে পারে। আত্মসচেতন রাবু ‘এজমালি সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়েও থাকে না পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেটা নাকি তার আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে মস্ত বড় বাধা’ (কায়সার, ১৯৮৭ : ২৩০)। এই সচেতনতাই তাকে বিশ্বমানবতাবোধে উন্নীত করে। তাই বিশাল মানবগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্টের চেয়ে ব্যক্তিগত ছোট ছোট দুঃখ-কষ্টগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখতে চায় না সে। মালুর সাথে আলাপকালে তার এই মতাদর্শের প্রকাশ ঘটে। স্বাধীনতা আন্দোলন-কালে মেয়েরাও যে মুক্তির চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিল এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, রাবু তাদের প্রতিনিধি স্থানীয়। বাঙালি সমাজ-জীবনে স্বাধীনতা ও রেনেসাঁর যে প্রভাব পড়ে এ উপন্যাসে রাবুর ক্ষেত্রে তা কার্যকর। নারী স্বাতন্ত্র্যবাদী রাবু তাই কলমা পড়া প্রহসনমূলক বিয়ে মেনে নিতে পারে না। উল্লেখ্য, নারীর অধিকার ও নারী-স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী সমাজকাঠামোতে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া বা স্বামীর মতের অব্যাহতি হওয়া যে কোন নারীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর রকমের সাহসিকতার কাজ। ঔপন্যাসিক রাবু চরিত্রে সেই সাহসিকতাই প্রবিষ্ট করেছেন।

দেশবিভাগের পর রাবু প্রথমে ঢাকায় এসে স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে আলাদা বাসায় বসবাস করে এবং পরে শৈশবের পরিচিত সোঁদা মাটির ঘ্রাণের বাকুলিয়ায় ফিরে আসে। গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদানের মহান ব্রত নিয়ে সে স্কুল চালু করে এবং একই সাথে বৃদ্ধ দরবেশ বাবার শুশ্রুষায় আত্মনিয়োগ করে। ‘আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পর সামন্তবাদী আদর্শ পরিত্যাগ করে রাবু প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদী এবং পরে জাহেদের মতোই বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে। ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণচিন্তা রাবু চরিত্রকেও এক সংগ্রামশীল বৈশিষ্ট্য দান করে’ (খান, ১৯৯৭ : ১৭০)। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধে আলোকপ্রাপ্ত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের শক্তিতে উজ্জীবিত রাবু সৈয়দ পরিবারের তথা পুরুষতান্ত্রিক শোষণমূলক শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রথাগত আদর্শ পরিত্যাগ করে ‘স্বাধীনচেতা ও মুক্তিকামী’ নারীরূপে উপন্যাসে উপস্থাপিত।

“মুসলমান নারীর আত্মজাগরণের অসাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে রাবুর চরিত্রে— তার বিদ্রোহে। সে রাজনৈতিক মুক্তির পথিক, সে বিবাহিতা কিন্তু জাহেদকে ভালোবাসে। শিক্ষার আলোক-বন্যায় স্নাত রাবু বিদ্রোহ করেছে সমাজের বিরুদ্ধে। এমনকি নিজের পিতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছে সে। এ-বিদ্রোহ পচনশীল ক্ষয়িষ্ণু সমাজে অসাধারণ ও অনন্য।” (সাকলায়েন, ১৯৮৭ : ভূমিকা, ১০)

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সেকান্দর মাস্টারের আদর্শে রূপান্তরিত বিত্তহীন লেকু, হরমতি এবং প্রথমে বিত্তহীন ও পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত মালু প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থিতিতে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে প্রাণোচ্ছলতা আসে। এ উপন্যাসে পূর্ব বাংলার যে কয়টি গ্রামীণ পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদেরই একটি পরিবারের পুরুষ চরিত্র লেকু। বিশালাকৃতির লেকুর গোন্দা গোন্দা পায়ের গোছা, হাত ও মুখ এবং বুকুর পাটা কুলার মতো চওড়া। সামান্য জমি থেকে বছরে ‘বড়জোর পাঁচ মাসের খাদ্য

পায় লেকু। বাকি সাত মাসের খোরাকের জন্য তাকে বাঁশ ও ছন সংগ্রহে চলে যেতে হয় উত্তরে পাহাড়ে। কোনো বছর সে ধান কাটতে চলে যায় বাখরগঞ্জ অথবা আসামে। যুবক বয়সে প্রচুর খাটাখাটনি করে সংসারের খাই-খরচা চালিয়েও কিছু টাকা উদ্ধৃত হতো লেকুর। সে প্রথমে বার্মায় কুলির কাজ করত। একটা নিয়মিত বখরা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে কুলিসর্দার রমজান লেকুকে এ কাজটি পাইয়ে দেয়। বছর খানেক এ বন্দোবস্তে ভালোই চলেছিল লেকুর। কিন্তু ‘ফুল-বসনা রঙ্গমীর চটুল কটাক্ষ ওর মগজে ধরাল নেশা, দেহে তুলল আঙনের হিল্লোল।’ অধিক টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সে রমজানকে হিস্যা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং চাকরি খোয়ায়। পরবর্তী সময় বাপের মৃত্যুতে গ্রামে ফিরে আসে লেকু। লেকু সাহসী এবং জীবনযাপনের মৌলিক প্রশ্নে অটল। বার্মায় কাজ করার সময় সে রমজানকে বখরা দিতে রাজী হয়নি বরং রমজানের কুলিদের নিয়ে অন্য কুলিসর্দারের কাজে যোগ দিয়েছিল। লেকু চরিত্র প্রতিবাদী ও সংগ্রামী বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। হুরমতির শাস্তিকে সে ‘অল্যায্য’ মনে করে স্পস্টাস্পষ্টি বলে, ‘এক বাজারে দুই ভাও’। লেকুর চারপাশের মানুষগুলো বিভূহীন ও ভূমিহীন। অহোরাত্রি মানবেতর সংগ্রাম করেও তারা অন্ন ও ভিটেমাটির নিশ্চয়তা পায় না। সংগ্রামী লেকু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সেকান্দর মাস্টারের মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তি-প্রত্যাশি মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়। লেকুর স্ত্রী হেলু ওস্তাগরের মেয়ে আশ্বর। তার বাবাকে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে বিয়ে করেছে লেকু। রোগা-পটকা চেহারার আশ্বর এককালে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল। তার মৃত্যু হলে লেকু কন্যা ভুনিকে এক আত্মীয়ের বাসায় রেখে নিরুদ্দিষ্ট হয়।

সামন্তবাদী সমাজে বিদ্যমান নারী লাঞ্ছনার স্বরূপ উন্মোচনার্থে হুরমতি চরিত্রের সৃষ্টি ও বিকাশ। উপন্যাসের শুরুতেই কবীরা গুনাহ ‘যেনাহ’ করার অপরাধে হুরমতি লাঞ্ছনার শিকার হয়। বাল্যে মাতৃহারা হুরমতির জন্ম ও বৃদ্ধি সৈয়দ বাড়িতে। হুরের মতো সুন্দর মুখ ও ‘চিকন মুলোর মতো লাল আর তাজা’ দেহের অধিকারী হুরমতির কোলে কোলেই বেড়ে উঠেছে রাবু ও আরিফা। সৈয়দ বাড়িতে আশ্রিত ও পিতৃপরিচয়হীন হুরমতি পুরুষশাসিত সমাজের ‘নগ্ন লালসা আর কদর্য কামনার নিষ্ঠুর শিকার’। বিভূহীন হুরমতি স্বাধীনচেতা, সাহসী ও জেদী। তার কপালে ছাঁকা দেয়া হবে ও তাকে একঘরে করা হবে— একথা জেনেও বিচলিত হয়নি হুরমতি। ‘ঘাটা একটু শুকিয়ে এলেই সে মালুকে নিয়ে ‘পালাগান’ শুনতে যায়। কপালে কলঙ্ক আঁকা প্রতিশোধস্পৃহ হুরমতি কৌশলে কামাতুর রমজানের কান কেটে নেয়। যুদ্ধ চলাকালে জীবিকার সন্ধানে সে গোরা সৈনিকদের সঙ্গী হয়। বিভাগোত্তরকালে রোগে ও দারিদ্র্যে কঙ্কালসার হুরমতি রিক্সাচালক লেকুকে বিয়ে করে সংসারী হয়। বাকুলিয়ায় ফিরে এসে তারা রাবু, জাহেদ ও সেকান্দর মাস্টারের সাথে মিলিত হয়ে স্কুলের কাজে এবং মড়কের সময় অসুস্থদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করে।

সংশ্লুক উপন্যাসের নিম্নবিভূ, বিভূহীন, মধ্যবিভূ প্রতিটি চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে মালুকে কেন্দ্র করে। মালু এ উপন্যাসের প্রবহমান ঘটনাবলি পরিব্রাজকের মতো প্রত্যক্ষ করেছে। সে শৈশব থেকেই ডানপিটে স্বভাবের, মায়ের শাপ-শাপান্ত হজম করেই বড় হয়েছে। সৈয়দ বাড়ির অল্পে প্রতিপালিত ছোট মালু রাবুর স্নেহ-ভালোবাসার বলয়ে কৃতার্থ। শৈশব থেকেই উড়নচণ্ডী স্বভাবের মালু রাবুর বান্ধবী রানুর সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে তালতলি যাতায়াত করত এবং হুরমতিকে নিয়ে তালতলি-বাকুলিয়ার নানা স্থানে পালাগান শুনতে যেত। গানের প্রতি তার সহজাত ঝাঁকের কারণেই পালাগানের বয়াতিদের সুর শিশুবেলা থেকেই মালু নিজের গলায় তুলতে সাধ্যমত চেষ্টা করত। পারিবারিক প্রথাবদ্ধ নিয়মে নামাজ পড়ায় বা সকালের মজবের আমপাড়া-ছিপাড়া পাঠে মালু অনুৎসাহ বোধ করত তালতলির মেলায় শোনা গণিবয়াতির ঢং ও সুর তার মধ্যে চমক জাগায়। রাখালের গান, বিয়ের গান এমনকি প্রতিদিন সকালে শোনা মুস্জির আরবি ফারসি বয়াতগুলো থেকে বয়াতিদের গানের জাত-শব্দ-টান তার কাছে স্বতন্ত্র বোধ হয়। তার সঙ্গীতানুরাগে অনুপ্রেরণা জোগায় বালিকা রাসু ও তালতলির রানু। কলেজ ছুটিতে জাহেদ গ্রামে ফিরে এসে সেকান্দর মাস্টারকে নিয়ে মুসলিম জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করলে মালু তাদের সঙ্গী হয়। যুদ্ধচলাকালীন বাস্তবতার অভিঘাতে অভিঞ্জ মালু তালতলিতে গিয়ে রানুর কাছে মা-বাবার বিয়োগের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয় না। কেননা তাদের অভাব তখনও অনুভূত হয়নি তার জীবনে। তালতলিতে রামদয়ালের মনোহারি দোকানে মাসিক সাত টাকা বেতনে বহাল হয়ে মালু কলকাতার ছেলে অশোকের কাছে গানের তালিম নেয়। মালুর বিশ্বাস অশোকের আয়ত্তে রয়েছে সঙ্গীতের ‘মহামন্ত্র’। একসময় অশোক কলকাতায় চলে যায় এবং রামদয়ালের সাথে মতান্তর হওয়ায় মালুও কলকাতায় গমন করে। যুদ্ধের বাকি বছরগুলো অশোকের ঘরে গানে-বাদ্যে

ও বই পড়ায় কেটে যায় মালুর। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিখ্যাত পল্লীগীতি সম্রাট রাকিব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয় মালুর। তাঁরই উৎসাহে রেডিওতে ক্যাজুয়েল আর্টিস্ট হিসেবে 'চাম্ব' হয় মালুর। মালু লোকগীতির গায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে গ্রাম্য গায়ক থেকে রেডিওর শিল্পী হিসেবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তীকালে সঙ্গীতজগতে আধুনিকতার অভ্যুদয় ঘটায় এবং লোকগীতির প্রতি শ্রোতাদের আগ্রহ কমে যাওয়ায় মালুর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ফলে সঙ্গীতজীবী মালুর আর্থিক অনটন রিহানার মোহভঙ্গ ঘটায়। নগরজীবনে সফল শিল্পী হয়েও প্রথম দিকে মালু চরিত্রে স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। উগ্রতা আত্মসন্ত্রস্তিতায় নিজের অজান্তেই একটা দূরত্ব গড়েছিল ঘর-সংসার করা মানুষগুলোর সাথে। শেষাবধি বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়ে সে বিশ্বাসের সাথে ব্যবহারের সাযুজ্য ঘটিয়েছে। শিল্পী হয়েও সংযত পরিমার্জিত আচরণের স্পষ্ট সীমারেখা আয়ত্ত্ব করেছে।

বিভবান সমাজের প্রতিনিধি উচ্চাকাঙ্ক্ষী রিহানা সদ্য স্বাধীন দেশের নব্য প্রতিষ্ঠিত বেতারশিল্পী মালুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। সে গান শেখার নামে মালুর সান্নিধ্য লাভ করে এবং মালুও তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। তারা আনন্দ আর আলো-ছড়ানো ঘরের আকাঙ্ক্ষায় ঘর বাঁধে। আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দূরে, ঢাকায় এসে রিহানা অস্বস্তি বোধ করে এবং মধ্যবিত্ত মালুর অভ্যন্তর জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে একদিকে সে মালুর আর্থিক দৈন্যে বিব্রত এবং অন্যদিকে তার শিল্পীমন ও স্বামীমনের পার্থক্য বুঝতে পেরে দ্বিধাশ্রিত হয়। মালুও পুরুষসমাজের প্রতিনিধিরূপে স্ত্রীর প্রতি রক্ষণশীল ও আপন অধিকারসমূহ আরোপে সচেতন। ঔপন্যাসিক রিহানা প্রসঙ্গে মালুকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছে। যেমন - 'দুটো মন ওর। শিল্পী মন, দরদী উদার। স্বামী মন, রক্ষণশীল, অধিকার কাতর। সব মনই বুঝি এমনি। এমনি ঠুঁথুগুঁথ। আর দুয়ের মাঝে সংঘাত চলেছে অবিরাম।' (কায়সার, ১৯৮৭ : ২৯২)

আভিজাত্যে গর্বিত ফেলুমিএগা নীতি-নৈতিকতা বর্জিত চরিত্ররূপে উপন্যাসে চিত্রিত। চতুর ও কৌশলী ফেলুমিএগা হুমতী প্রমুখ মেয়েদের রূপোজীবী হওয়ার পশ্চাতে ভূমিকা রাখে। আবার, তাদের প্রহসনমূলক বিচারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে অমানবিক শাস্তিপ্রদানে সহায়তা করে। ফেলুমিএগাকে এরূপ সামন্ত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে লোভী ও ধূর্ত রমজান। ফেলুমিএগা সুচতুর। মিএগগিরি টিকিয়ে রাখার জন্য সে সময়োপযোগী সকল অস্ত্রই ব্যবহার করে। দরিদ্র প্রজাদের খাজনা মওকুফের আরজি নিয়ে সেকান্দর মাস্টার ফেলু মিএগার সাথে সাক্ষাৎ করলে সে উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করতে থাকে এবং পরক্ষণেই বলে: 'না, না তোমার কথা আলাদা, তুমি যখন খুশি দিও, তবে ওই ব্যাটাদের বলে দাও টাকা চাই আমার, টাকা নগদ টাকা, নতুবা জমি' (কায়সার, ১৯৮৭ : ৮১)। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয়তায় বিশ্বাসী ফেলুমিএগা। পাকিস্তান আন্দোলন-কালে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে মুসলিম লীগের প্রথম সারিতে দাঁড়ায়। 'আলীগড় আন্দোলনে' প্রভাবিত জাহেদ গ্রামে এসে মুসলিম লীগ গঠনে প্রয়াসী হলে ফেলু মিএগা সভাপতি হতে আগ্রহ প্রকাশ করে বঞ্চিত হয়। ফেলু মিএগার এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার নীতিহীন সুবিধাবাদী চরিত্রের স্ফুরণ ঘটেছে। সাহেদ একটি সুস্পষ্টনীতির মাধ্যমে দেশে স্বাধীন করে তার বিকাশ ও উন্নতি সাধন করতে চায়। আর ফেলুমিএগা মুসলিম লীগের রাজনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করতে আগ্রহী। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সে স্ত্রী হালিমার অলংকার বিক্রয়ের টাকায় তালুকগুলো পুনরুদ্ধার করলেও বিভাগান্তরকালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার ভোগ করতে পারেনি। বরং তার স্থান দখল করেছে তারই এককালের পেয়াদা ধূর্ত ও বেঈমান রমজান। ফেলুমিএগার এই নিঃস্ব ও অসহায়তার চিত্র লেখকের শ্লেষাত্মক বর্ণনায় উজ্জ্বল -

“আলিবর্দির বাংলা বুঝি ফিরে এল না ফেলু মিএগার জীবনে। মোগল পাঠানের রক্ত সেই যে পানসে হয়ে গেছে, শরাবী তেজে গরম হয়ে উঠল না সে রক্ত। শেষ দানেও হেরে গেছে ফেলু মিএগা।” (কায়সার, ১৯৮৭ : ১৮৯)

'সংশপ্তক' উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে শহীদুল্লা কায়সার এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে দ্বন্দ্ব ও সংকটপূর্ণ সমাজ ও সময়ের পাত্রপাত্রী হিসেবে রূপাঙ্কিত করেছেন। 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্দোলন-সংঘাতের মধ্য দিয়ে জাহেদের চেতনা ও কর্মধারার যে রূপান্তর, তাকে রূপায়ণ করতে গিয়ে শহীদুল্লা কায়সার অনেকটা নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন। আদর্শায়িত চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও সেকান্দর মাস্টারের

পরিণতিও বাস্তব প্রয়োজনের টানে পরিবর্তনশীল। কিশোরী রাবুর ক্ষেত্রে বর্ণনা ও চিত্রের প্রয়োগ ঘটলেও ব্যক্তিজীবনের ঘটনা-অনুষঙ্গেই অনিবার্য হয়ে পড়েছে নাট্যরীতি। মালুর চরিত্রায়ণে নাটকীয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গীতিময়তা। ফেলু মিঞা ও রমজান চরিত্রের রূপায়ণ বহুলাংশে চিত্রময় (Pictorial)। হুমতি ও লেকুর জীন-প্যাটার্ণ উন্মোচনে বর্ণনার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে 'নাটকীয়তা' (খান, ১৯৯৭ : ১৯৮)। শহীদুল্লা কায়সারের দক্ষশিল্পীসুলভ সৃজনক্ষমতায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো 'টাইপ' না হয়ে সংগ্রামী ও সম্ভাবনাময় সজীব চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

“সংশ্লুক একদিকে যেমন অবক্ষয়মান সামন্ত বাদী ধ্যান-ধারণায় লালিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর মানসিক দন্দ সংঘাত আর স্বাভাবিক মৃত্যুর কাহিনী, অন্যদিকে তেমনি মুসলিম-সমাজের ক্রমিক জাগৃতির ইতিহাস” (বুয়া, ১৯৮৮ : ৫৮)।

উপন্যাসের পরিণতিতে গ্রেফতারকৃত জাহেদের সংলাপে এই আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে –

“সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙ্গে। পকেট থেকে রুমাল বের করল জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মত। চৌঁচিয়ে চৌঁচিয়ে বলল, চিন্তা করিসনে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব।” (কায়সার, ১৯৮৭ : ৩৬৬)

এ উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় ও ঘটনার নতুনত্বে শহীদুল্লা কায়সার জীবনের সমগ্রতাকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষা নির্মাণে, আরবি-ফারসি ও আঞ্চলিক শব্দ নির্বাচনে পটুতা দেখিয়েছেন। তিনি যেমন মানবমনের অন্তর্দন্দ উন্মোচন এবং ব্যক্তিগত ও পরিবারের সমস্যাবলি উন্মোচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, বাকুলিয়া-তালতলির প্রাকৃতিক আবহ বর্ণনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই উপন্যাসিকের হাতে শিল্পরূপ পেয়েছে। সার্বিক অর্থে, এ উপন্যাসের বিষয় ও বক্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

### Bibliography:

- আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস, ১৯৮৫, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- ইকবাল, ভূঁইয়া, ১৯৯১, বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-'৭১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- কায়সার, শহীদুল্লা, ১৯৯৭, 'সংশ্লুক', গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত, শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- খান, রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৭, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ১৯৯১, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- বুয়া, সুরত, ১৯৮৮, শহীদুল্লা কায়সার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- মুসা, মনসুর, ১৯৭৪, পূর্ববাংলার উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- সাকলায়েন, গোলাম, ১৯৯৭ (সম্পাদিত) শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- হোসেন, সৈয়দ আকরম, ১৯৯৭, প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।